নিখিল ও একটি দোতারার গল্প

নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের জীবনালেখ্য

বিকাশ রায়

নিখিল ও একটি দোতারার গল্প
বিকাশ রায়

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০২২

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
রাসেল আহমেদ রনি

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য: ২৫০ টাকা

Nikhil o Akti Dotarar Golpa by Bikash Roy Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudra-E-Khuda Road Kantabon Dhaka 1205 First Edition: November 2022
Phone: 02223368736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96928-2-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

যারা আমাকে আলোর পথের গল্প বলেছেন,
সেই সকল শিক্ষাগুরুকে

ভূমিকা

নিখিল ও একটি দোতারার গল্প বিকাশ রায়ের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'গল্প' শব্দ যুক্ত হলেও এটা গল্পগ্রন্থ বা ছোটগল্পের সংকলন নয়। তবে বলা যেতে পারে গল্পের মোড়কে জীবনীগ্রন্থ। যদিও লেখক বলেছেন এটা যথার্থ জীবনী নয়। কাঠামোবদ্ধ জীবনী লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেননি। গ্রন্থটি পাঠ করলে লেখকের বক্তব্যের সত্যাসত্য উপলব্ধি করা যাবে। বিশিষ্ট বংশীবাদক, দোতারাবাদক ও সুরসাধক নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের জীবনের গল্প বলেছেন লেখক। শিল্পী নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার গুণী শিল্পী ও সংগীতসাধক। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তির কল্যাণে বিপুল বহুমাত্রিক প্রচারের সময়েও তিনি ভীষণভাবে আত্মপ্রচারবিমুখ। ব্যক্তিজীবন এবং কর্মজীবন উভয়ক্ষেত্রে এ কথা সত্য। নিজের অন্তর্গত একান্ত ভালোবাসায় তিনি শিল্পের এ সাধনা করে চলেছেন। নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার বংশীবাদক হিসেবে পরিচিত হলেও তাঁর অন্যতম সাধনার বিষয় দোতারা। তাঁকে দোতারা সম্রাট বললেও কোনো রকম অত্যুক্তি হবে না। সেই শৈশবে-কৈশোরে একখণ্ড কাঠের সঙ্গে গুনা (চিকন তার) বেঁধে দোতারা তৈরির চেষ্টার সার্থকতা তাঁর জীবনে কীভাবে হয়েছে, কীভাবে সেই শৈশবে তিনি বাঁশির প্রেমে পড়েছিলেন তারই ইতিবৃত্ত গল্পের আবরণে চমৎকার উপস্থাপন করেছেন লেখক। আজকাল আমাদের দেশের মানুষের একটা অদ্ভুত মানসিকতা তৈরি হয়েছে যে, রাজধানী ঢাকায় না থাকলে সাহিত্য-শিল্পের চর্চা বা সাধনা সম্ভব হবে না। প্রচারের সুযোগ সেখানে বেশি, কিন্তু সাধনার ক্ষেত্র উপযুক্ত নয়। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও যে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতির উন্নত চর্চা হচ্ছে এবং সেখানেও যে মেধাবী ও প্রতিভাবান শিল্পী সাধক আছেন, কাজ করছেন তার অন্যতম উদাহরণ নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার। এই নিভৃতচারী, নীরবে কাজ করে যাওয়া মানুষটির জীবন ও কর্মের কথকতা লিখে তাঁর ছাত্র ও শিষ্য বিকাশ রায় শুধু গুরু-ঋণ স্বীকার করেননি, আমরা যারা নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের মুগ্ধ

শ্রোতা, তাঁকে ভালোবাসি তাদেরও দায়মোচন করেছেন। ছোট ছোট প্রাসঙ্গিক শিরোনামে অধ্যায়গুলো বিভাজন করে নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের জীবনের নানা অধ্যায়ের সুচারু বর্ণনা করেছেন লেখক। সহজ মানুষ নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের মতো অত্যন্ত সহজ সরল ভাষায় বিকাশ রায় তার কথাগুলো বলে গেছেন। পাঠকের পড়তে ক্লান্তি তো লাগবেই না বরং নিখিলের বাঁশি কিংবা দোতারার সুরের মতো আনন্দ দেবে। বিকাশ রায়ের প্রথম গ্রন্থ হলেও লেখার মধ্যে যথেষ্ট পরিপক্বতার ছাপ আছে। বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ, বংশীবাদক, দোতারাশিল্পী ও বহুবিচিত্র লোক-বাদ্যযন্ত্র নির্মাতা নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার ও তাঁর প্রিয়ভাজন শিষ্য এ গ্রন্থের লেখক আমার স্নেহের ছাত্র বিকাশ রায়ের সুস্থ ও সৃজনশীল দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

শংকর কুমার মল্লিক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা
সরকারি ব্রজলাল কলেজ, খুলনা

গুরুদক্ষিণার অর্ঘ্য

আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
তারি সাথে, প্রভু, মিলিয়া তোমার প্রীতি
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল গীতি
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝে নিজেরে করিয়া দান ॥
[প্রতিসৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

গুরুভক্তি কিংবা গুরুদক্ষিণার প্রসঙ্গ এলেই প্রথমেই আমাদের পৌরাণিক কাহিনি একলব্য এবং আরুণির আখ্যান মনে পড়ে। আধুনিক কালে এসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি অবলম্বনে নির্মিত 'গুরুদক্ষিণা' সিনেমার নামটিও সহসা স্মরণে আসে এবং সিনেমার গানটিও যেন কর্ণকুহরে বাজে। গুরুভক্তি এবং গুরুদক্ষিণার নিদর্শন হিসেবে গুরুর নামে গ্রন্থ উৎসর্গ কিংবা গুরুকে নিয়ে কোনো শিষ্যের গ্রন্থরচনার নজিরও হরহামেশাই আমাদের চোখে পড়ে। 'তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারই দান'—এই রবীন্দ্রবাক্যকে ধারণ করে গুরুর কাছ থেকে অর্জিত বিদ্যা গুরুকে নিয়ে রচিত গ্রন্থের মাধ্যমে অর্ঘ্যপাত্র হিসেবে গুরুর হাতে সমর্পণ করা হয়। সম্প্রতি বিকাশ রায় রচিত *নিখিল ও একটি দোতারার গল্প* বইয়ের পাণ্ডুলিপিটি পড়তে গিয়ে গুরুদক্ষিণার এক অনুপম অর্ঘ্যের নিদর্শন পাওয়া গেল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গুণী বাদ্যযন্ত্রশিল্পী নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার দোতারাসহ নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাদনে পারদর্শী হলেও নিজেই দোতারাসহ বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র নির্মাণ করতে পারেন। সে কারণে গ্রন্থনামে দোতারাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অধ্যাপক বিকাশ রায় তার বাদ্যযন্ত্র শিক্ষার গুরু নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারকে নিয়ে এমন একটি চমৎকার গ্রন্থ রচনা করে যথার্থই গুরুদক্ষিণা দিতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বিকাশ রায় রচিত *নিখিল ও একটি দোতারার গল্প* প্রচলিত অর্থে কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়। অর্থাৎ জীবনীগ্রন্থে যেমন সাল-তারিখ-স্থান,

বিশেষত নানারকম তথ্যের যথাসম্ভব ঠাসা সমাহার থাকে এই গ্রন্থে সেরকম নেই। ঠিক নেইও বলা যাবে না, অবশ্যই আছে। তবে সেটা অন্যভাবে। অর্থাৎ লেখক নিখিল কৃষ্ণের জীবনের ঘটনাবলি সাল-তারিখ মিলিয়ে ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেননি, তিনি লিখেছেন গল্প বলার ঢঙে এবং তার গল্প পরিবেশনের ভাষাভঙ্গিটিও ভারি সুন্দর, ভাষাপ্রবাহ তরতর করে এগিয়ে গেছে নদীর স্রোতের মতো। একটি জীবনীগ্রন্থে যেভাবে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদের নামকরণ করা হয় তারও ব্যতিক্রম লক্ষ করা যায় এই গ্রন্থে। অবশ্য এই নামকরণে সর্বৈব নতুনত্ব না থাকলেও গতানুগতিক প্রবাহের ব্যতিক্রম নিঃসন্দেহে।

নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের জীবন যথেষ্ট ঘটনাবহুল। চড়াই-উৎরাইপূর্ণও। এই গ্রন্থটি কেবল ব্যক্তি নিখিল কৃষ্ণের জীবনীই নয়, তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা অন্যদের জীবন এবং অন্যদের জীবনের সাথে জড়িয়ে থাকা তার জীবনের নানান ঘটনা ও স্মৃতি, তার সমকালে ঘটে যাওয়া পরিবার, সমাজ, দেশ এমনকি বহির্বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের নানান ঘটনা দুর্ঘটনা এবং সেগুলোর প্রভাব প্রতিক্রিয়ার ছায়াপাত ঘটেছে এই গ্রন্থে। সুতরাং নিখিল কৃষ্ণকে জানতে গিয়ে পাঠক সমকালের একটি চিত্র, সম্পূর্ণ কিংবা অসম্পূর্ণ, স্পষ্ট কিংবা অস্পষ্ট যেমনই হোক না কেন জানার সুযোগ পাবেন। তাছাড়া একজন নিখিল কৃষ্ণকে শিল্পী হয়ে ওঠার গল্প শুনতে শুনতে বর্তমান প্রজন্মের কোনো না কোনো তরুণের মনে এই রকম একজন শিল্পী হয়ে ওঠার স্বপ্ন-সাধ জাগতে পারে। দূরবর্তী উদাহরণের চেয়ে নিকটতম উদাহরণ মানুষকে বেশি প্রভাবিত করে। নিখিল কৃষ্ণ বর্তমান প্রজন্মের কাছে নিকটবর্তী উদাহরণ। অনেকটা পথ পেরিয়ে আসা অতীতের উদাহরণ নন।

একজন গুরু কিংবা শিক্ষকের বহুসংখ্যক শিষ্য কিংবা শিক্ষার্থী থাকে। একজন গুরু কিংবা শিক্ষক যেমন সকল শিষ্য-শিক্ষার্থীকে মনে রাখেন না, রাখতে পারেনও না, তেমনি সকল শিষ্য-শিক্ষার্থীও গুরু-শিক্ষকের প্রতি যথার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন না। এই গ্রন্থটি গুরু-শিষ্যের পারস্পরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসার এক অনন্য উদাহরণ। এই গ্রন্থটি অপর কোনো শিষ্যকে তার গুরু সম্পর্কে লিখতে উদ্বুদ্ধ করতেও পারে। একজন গুণী মানুষ সম্পর্কে মানুষ অনেক কথাই জেনে থাকে, তার চেয়ে বলা ভালো শুনে থাকে। কিন্তু শোনা কথা কখনো কখনো প্রমাণ-অযোগ্য হয়ে পড়ে, বিভ্রান্তিও ছড়ায়। সে কারণে প্রামাণিক তথ্য

হিসেবে একটি গ্রন্থের কোনো বিকল্প নেই। এই গ্রন্থটি ভাবীকালে নিখিল কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্যের নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত উৎস হয়ে থাকবে। পার্থিব জীবনের সকল সুখ-সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে কেবল শিল্পের জন্য জীবন উৎসর্গ করা এই ত্যাগী গুণী যন্ত্রশিল্পীকে গ্রন্থাকারে পাঠকের সামনে হাজির করার জন্য তরুণ লেখক শ্রীবিকাশ রায়কে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ এবং আন্তরিক শুভকামনা জানাই।

বিভূতিভূষণ মণ্ডল
প্রাবন্ধিক ও গবেষক

লেখকের কথা

জীবনীগ্রন্থ বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি *নিখিল ও একটি দোতারার গল্প* ঠিক সেরকম নয়। একজন মানুষের পূর্ণ কীর্তিকে ধারণ করার মতো প্রাজ্ঞতা এবং ধৈর্য দুটোর কোনোটাই আমার নেই। আমি ইতিহাসের ছাত্র নই ফলে ইতিহাস লিখতে যাওয়ার দুঃসাহসও করিনি। লেখার চেষ্টা করেছি জীবন নিয়ে গল্প। মানুষের জীবন তো আর ইতিহাসের বাইরের কোনো ব্যাপার নয়। ফলে গল্পগুলো জড়িয়েছে সময়ের ইতিহাসের সঙ্গে। আমাদের নৈমিত্তিক জীবন কতটা ঐতিহাসিক আর সেটা অন্য মানুষের জানার আগ্রহকে কতটা আন্দোলিত করে, এ সবই নির্ভর করে আমাদের স্বকৃত কীর্তির ওপর। অমরত্বের সাধনা সবার থাকে না তবু মানুষের অজান্তে মানুষ নিজেই বপন করে তার অমরত্বের বীজ। এ গ্রন্থে আলোচিত ব্যক্তি নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার আমার যন্ত্র শিক্ষার শিক্ষক। গুরু হিসেবে আমি তাঁকে যতটা পেয়েছি তার চেয়ে বেশি পেয়েছি মানুষ হিসেবে। বর্তমানে মানুষই সর্বাপেক্ষা দুর্লভ ফলে তাঁকে নিয়ে আমার লেখার আগ্রহ জন্মায়। তাই ফকিরহাটের উত্তরপাড়ায় বেড়ে ওঠা নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ঘটনাকে গল্পের মতো করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি এ গ্রন্থে।

'নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার' নামটির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে ছাত্রাবস্থায় বেতার শুনতে গিয়ে। খুলনা বেতারে তাঁর নাম বিভিন্ন সময়ে শুনেছি। একদিন সকালে বাঁশিতে একটি রাগ (তোড়ি) বাজানোর পর তাঁর নামটি উল্লেখে আমার মনের ভেতরে বেশ স্থায়ীরূপে সেটি জায়গা করে নেয়। এর কিছুদিন পর আমি শখের বশে বেহালা শিখতে আগ্রহী হই। তখন বেহালা শেখার গুরুর সন্ধান করতে গিয়েও এই নিখিল কৃষ্ণ মজুমদার নামটি আবার আমার সামনে আসে। একসময় কোনো কারণে আমার বেহালা শেখা থেমে যায়। মাথা থেকে বেহালার ভূত নামলেও বাজনা শেখার ভূত শখের সাড়া গাছে তেমনই সমাসীন থেকে পা দোলাতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে ২০১৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে

আমি চন্দন দাস নামে এক বড়ভাইয়ের কাছ থেকে ফোন নম্বর এবং ঠিকানা সংগ্রহ করে নিয়ে হাজির হই নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের কাছে। তাঁর কার্যকলাপ দেখে আমার ভালো লাগে বটে কিন্তু কেন জানি না সেদিন নীরবেই সেখান থেকে চলে আসি। তার পরের বছর অমিত রায় নামে আর এক ছোটভাই কোনো এক কাজ নিয়ে আমার কাছে আসে এবং কথা প্রসঙ্গে সে আমাকে বাঁশি বাজিয়ে শোনায়। সেই দিন আমি তার সঙ্গে আবার যাই নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের কাছে এবং ঐ দিনই একটি মেন্ডোলিন কিনে তাঁর কাছে বাজনা শিখতে শুরু করি।

বাজনা শেখা শুরু করার পর আমার নিয়মিত যাতায়াত চলতে থাকে 'বাংলার বাউল শিক্ষা নিকেতন' তথা নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের কাছে। এ সময়েই তাঁর কাছে যাতায়াত করতে করতে আমি ধীরে ধীরে পরিচিত হই 'কল্পতরু আসর' এবং 'মুরলী লোকসংস্কৃতি বিকাশকেন্দ্র'-এর সঙ্গে। বার্ষিক গুরুশিষ্য মিলনমেলায় গিয়ে পরিচিত হই ওসমান শেখ, শেখ আলী আহম্মেদ, ডা. সৈয়দ আল-আমিনসহ বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে। ফলে এতসব মানুষ এতসব প্রতিষ্ঠান যাকে নিয়ে আবর্তিত সেই নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। একদিন নিরিবিলিতে আলাপচারিতার সময় দোতারার প্রতি তাঁর আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে আমাকে শোনান এক অদ্ভুত কাহিনি। কেন জানি না সেদিনই আমার ইচ্ছে হয়েছিল 'একটি দোতারার গল্প' নামে একটি গল্প লিখতে। তারপর বিভিন্ন সময়ে তাঁকে জানার অভিপ্রায়ে তাঁর কাছ থেকে শোনা শুরু করি তাঁর জীবনের গল্প। প্রথমদিকে তিনি বুঝতে পারেননি আমার উদ্দেশ্য। পরবর্তীতে যখন দোতারা নিয়ে আগ্রহ জন্মায় তখন আমি স্যারকে (নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারকে) বলি যে, আমি দোতারা নিয়ে একটা লেখা লিখতে চাই। তিনি বলেন, 'সেটা তো ভালো। দোতারা তৈরি, বাজনার কৌশল নিয়ে যদি পারো লেখো। দেবাশীষও (নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের জনৈক ছাত্র দেবাশীষ মজুমদার) লেখা শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করেনি। দেখো, তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে কিছু লিখে রাখতে পারো কি না।'

লেখা শুরু করার মানসে বিভিন্ন জায়গা ও ব্যক্তির কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য যখন সংগ্রহ করে চলেছি তখনই একদিন আমাকে ফোন করেন নরসিংদীর অতুলচন্দ্র দে। তিনি আমাকে কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, স্যারের জীবন নিয়ে যেন আমি কিছু লিখি। আমি তখন তাকে জানাই যে আমি দোতারা নিয়ে এবং স্যারের দোতারাবাদন কৌশল নিয়ে একটা লেখা

শুরু করেছি। স্যারের জীবন নিয়েও অনেক তথ্য আমি সংগ্রহ করেছি তবে সেটা লিখতে গেলে তার অনুমতির দরকার আছে। তখন অতুলচন্দ্র দে আমাকে বলেন, অনুমতি তিনি চাইবেন এবং আমিও যেন একটু আলাপ করি স্যারের সঙ্গে। স্যারের অনুমতি পাওয়ার পর তাঁকে রোজই বিরক্ত করতে শুরু করি বিভিন্ন গল্প শোনার জন্য। এভাবে গল্প শোনাও চলতে থাকে আমার লেখাও এগোতে থাকে। কিন্তু জীবন নিয়ে লিখতে গিয়ে জীবনী লেখার বদলে লিখে ফেলি কয়েকটি গল্প। এই গল্পগুলোই একত্রে *নিখিল ও একটি দোতারার গল্প*।

আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক শংকর কুমার মল্লিক এবং প্রাবন্ধিক স্বপন নাথ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরামর্শ দিয়ে আমাকে এ লেখায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তাদের প্রতি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রাবন্ধিক বিভূতিভূষণ মণ্ডল অসীম ধৈর্য নিয়ে আমার লেখার পাণ্ডুলিপিটি পড়েছেন এবং সেটির ভুল সংশোধন করেছেন। যে আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি আমাকে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন সে জন্য তাঁর কাছে আমি দারুণভাবে কৃতজ্ঞ। ভাতৃপ্রতিম স্নেহে তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছেন সব সময়ে। নত মস্তকে তাঁর কাছে আমি ঋণ স্বীকার করছি এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

লেখাটি ছোট এবং সামান্য হলেও নিজের অক্ষমতাহেতু আমি বারবার খ্যাত অখ্যাত বেশ কিছু ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে বিরক্ত করেছি তথ্য জানার জন্য। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক তানভীর মোকাম্মেল, সংগীত পরিচালক সৈয়দ সাবাব আলী আরজুসহ অতুলচন্দ্র দে (নরসিংদী), মো. ফরিদুল ইসলাম, বলরাম মহলদার, অভিষেক বিশ্বাস, অনুরাগ মণ্ডল, সাহিত্যিক সফিয়ার রহমান, অমিত সাহা (মাথাভাঙ্গা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত), অধ্যাপক জীবন কুমার কর্মকার, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও সহকর্মী অধ্যাপক মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, তুর্বসু সরদার, সঞ্জয় ঘোষ, বিপ্রদাস সরকার, আলমগীর কবীর, জগন্নাথ সরকার, সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নয়ন বিশ্বাস, দেবপ্রসাদ মণ্ডল, আমার পিতা দুলাল চন্দ্র রায়, আমার দুই অগ্রজ দিপক কুমার রায় ও প্রভাস রায় এবং শ্বশুরমশাই অধ্যাপক রেবতী রঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ আমাকে বিভিন্নভাবে তথ্যদান করেছেন এবং প্রেরণা জুগিয়েছেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমার সহধর্মিণী ঐশী মণ্ডল সার্বক্ষণিক পাশে থেকে এবং পারিবারিক দায়িত্বভার থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রেখে আমাকে লেখার অবকাশ সৃষ্টি করে প্রেরণা জুগিয়েছেন। তার সঙ্গে

আমার সম্পর্কটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের নয়। সুতরাং এ কাজে বিরত থাকলাম।

নিখিল ও একটি দোতারার গল্প বইটি প্রথমে আমি দুটি অংশে বিভক্ত করি। প্রথম অংশে নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের জীবন নিয়ে গল্প এবং দ্বিতীয় অংশে দোতারার সামান্য ইতিহাস, পরিচিতি, তৈরি পদ্ধতি এবং বাদন শিক্ষণ। কিন্তু বিজ্ঞজনের পরামর্শে আমি শুধু প্রথম অংশটুকু রেখেই বইটি প্রকাশে মনস্থির করি। বইটি যদি পাঠকের ভালো লাগে তবেই আমার চেষ্টা সার্থক হবে। নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের মতো গুণীজনকে নিয়ে লেখার সুযোগ পাওয়া আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাঁর সমস্ত জীবনের কীর্তিকে ধারণ করতে না পারার ব্যর্থতা নিয়েই বইটি ছাপা হলো এ জন্য আমি পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। একজন নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারকে পাঠক সামান্য হলেও জানতে পারবেন এ গ্রন্থে, অখ্যাত আরও অনেক নিখিল কৃষ্ণ মজুমদারের অক্লান্ত কর্মকীর্তি অমরতা পাক এই কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে

২০ নভেম্বর ২০২২ **বিকাশ রায়**

সূ চি প ত্র

এক টুকরো একাত্তর ১৭
মাঠের পারে বাঁশির সুর ২৫
সেই স্মৃতিময় হারমোনিয়াম ২৯
সুরের স্রোতে কালের খেয়া ৩৩
একটি দোতারার গল্প ৪০
পরীক্ষা প্রার্থনীয় ৪৭
আমি বন্ধুর প্রেমানলে পোড়া ৪৯
ভিন পথের পথিক ৫৩
রেলগাড়ির সেই লোকটি ৫৮
বাঁশি কেন গায় ৬১
বেতারের বিচিত্র দিন ৬৭
বাদাবনের গল্প ৭৮
রেখে যাই স্মৃতির লেখা ৮৪
চোর দিয়ে চোর ধরাধরি এ কী কারখানা! ৯২
অন্তর্জালের বন্ধনে ৯৮
যেতে যেতে পথে ১০৬
সহজ আনন্দবাজার ১১৬

এক টুকরো একাত্তর

গ্রামের নাম উত্তরপাড়া। বিকেলের রাঙা আলো ঘন গাছপালার জঙ্গল ঠেলে যেন পৌঁছাতে পারছে না আর গাঁয়ে। মেঠোপথটায় সূর্য ডোবার অনেক আগেই আঁধার এসে ঘিরে ধরেছে। দু-একটা ঝিঁঝি পোকাও ডাকা শুরু করেছে ঝোপঝাড়ের জঙ্গলে। রাস্তার পাশে পিটালি গাছ থেকে কী একটা লতা তার একরাশ ছোট ছোট পাতা আর বেগুনি ফুল নিয়ে ঝুলে রয়েছে দড়ির মতো। মাটির রাস্তা ধরে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছেন পাগলা দেয়াপাড়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক সুধীর মজুমদার। শান্ত এ গ্রামের মতোই স্বভাবে শান্ত মানুষটিকে লোকে অবশ্য সুধীরমাস্টার নামেই চেনে। পুরনো কর্তাদের হুই পদবি কীভাবে যে সুধীরের নামের শেষে মজুমদার হয়ে গেছে সেটা অবশ্য জানেন না তিনি। এখন তিনি সকলের সুধীরমাস্টার। খানিকটা চিন্তাযুক্তভাবেই পথ চলছেন তিনি। সাম্প্রতিক দেশের অবস্থা তাকে ভাবিয়ে তুলেছে। হিন্দুরা দেশ ছাড়ছে এ সংবাদ প্রতিদিনই আসে কোথাও না কোথাও থেকে। কী হবে কে জানে! শ্যামল ছায়াঘেরা পিতৃপুরুষের এ ভিটে ফেলে এক পাও নড়ার ইচ্ছে নেই তার, মরণ যদি হয় তাহলে এই মাটিতেই হোক।

দেশে গণ্ডগোল তাই বলে বসে থাকলে তো চলে না। চাষবাসের সময় চলে যাচ্ছে। সেদিন ফকিরহাটে গিয়ে সুধীরমাস্টার 'ইরি' ধানের বীজ এনেছেন। অনেকেই তাকে বলেছে, 'ইরি' ধানের ফলন বেশি এবং অত্যন্ত দ্রুত তার ফসল তোলা যায়। খাটুনি বেশি অথচ দেশি জাতের ধানে উৎপাদন খুবই কম। সারা বছরে তার পরিবারে যত ধান লাগে, তা উৎপাদন যেন ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। ইরিধানের বেশি ফলনের কথা শুনে, উৎসাহে সেদিন বাড়ি ফিরে মাস্টার তার বাড়ির চাষবাসের পরামর্শদাতা বন্ধু আজিত শেখের ছেলে ওসমান আর ন ছেলে মৃণালকে বলেছিলেন জমি প্রস্তুত করে রাখতে। ভাবতে ভাবতে ফিরছেন সুধীরমাস্টার, ওসমান আর মৃণাল কতদূর কী করেছে তা না দেখা পর্যন্ত তার স্বস্তি নেই।

বর্ষা শুরুর এ সময়টাতে মাঠে মাঠে ধান বপনের হিড়িক পড়ে যায়। কাজের লোকেরও অভাব দেখা দেয়। সুধীরমাস্টারের জমিতে ধান লাগাতে গিয়ে দেখা দিল তেমনই বিপত্তি। একা ওসমানের কাঁধে এসে পড়ল চাপ। যাই হোক, এভাবে দিন

কয়েক যেতেই ওসমান আরেকজন লোক জুটিয়ে ফেলল। মৃণাল কিংবা সুধীরমাস্টারের অন্য ছেলেরা আর যাই হোক হালচাষে তত পটু নয়।

ওসমানের আনা ছেলেটি এসেই চাষবাসে মৃণাল কিংবা অন্যদের একেবারে তাক লাগিয়ে দিল। কাজে তার অত্যন্ত উৎসাহ, যেমনি সে কর্মঠ তেমনি সে দায়িত্ববানও। ছেলেটির বাবা সুধীরমাস্টারের বন্ধুস্থানীয় লোক এবং ছেলেটিও তার মেজ ছেলের বন্ধু। নিষ্কর্মাভাবে ঘুরে বেড়ালেও সে যে কাজের ছেলে তা বুঝতে ভুল করে না আজিত শেখ, তাই নিজের ছেলে ওসমানের সঙ্গে বন্ধু সুধীরের জমিতে কাজে লাগিয়ে দিল তাকে। এতদিন বন্ধু আজিত শেখ সুধীরমাস্টারকে বিপদে আপদে সময়োপযোগী সাহায্য ও পরামর্শ দিয়ে এসেছে, এখন চাষের জন্য রোজ উৎসাহিত করে যাতে নিজের জমিতে অন্তত সারা বছরের অন্নসংস্থানটা হয়।

নতুন এ ছেলেটির নামও আজিত। দিন কয়েক যেতে না যেতেই মাস্টারের চাষাবাদের মূল লোক হয়ে গেল সে। কীভাবে জমি চষতে হবে, কখন বীজ ফেলতে হবে, কখন সার দিতে হবে কীভাবে দিতে হবে সবকিছুই যেন তার নখদর্পণে। সুধীরমাস্টারের জমিজমা আর চাষবাসের কাজে তার ছেলেদের গুরু ওসমান শেখ হলেও আজিতের পারদর্শিতায় সবাই হার মেনে যেত। অত্যন্ত করিৎকর্মা এই লোকটির ওপর মাস্টারেরও অল্পদিনে অগাধ ভরসা জন্মে গেল। সঙ্গে আছে ওসমান। সদা আনন্দময় ওসমানও করিৎকর্মা। তার মনের কোণে যে রোম্যান্স লুকিয়ে আছে তা তার মুখ দেখলেই বোঝা যায়। সেখানে সব সময়েই একটা অনুসন্ধিৎসু হাসির আভা লেগে আছে। অত্যন্ত পরিশ্রম যেমন সে করতে পারে তেমনি গানবাজনা, হাসি-তামাশাতেও তার সমান উৎসাহ। সাত নলি চেলে ফাঁদ পেতে সে ঘুঘু পাখি ধরে, সুযোগ পেলে মনের আনন্দে বাঁশি বাজায়। আজিত আর ওসমানের সখ্যও অনেক দিনের। এমনই দুজন দক্ষ চাষির শিষ্য হলো সুধীরের ন ছেলে মৃণাল (সোনা) আর তাদের দুজনের ভক্ত হলো সুধীরমাস্টারের ছোট ছেলে ছোট্ট নিখিল।

পরিকল্পনামতো ইরিধানের চাষ করেছেন সুধীরমাস্টার। বর্ষা শেষের মৃদু হাওয়া নাতিদীর্ঘ ধানের খেতে দোলা দিয়ে যায়, সেদিকে তাকিয়ে নতুন আশায় বুক ভরে ওঠে সুধীরের। আজিত আর ওসমানেরও খুশির সীমা নেই, সারা দিনের অসংখ্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে চোখ জুড়িয়ে যায় তাদের নিজেদের কীর্তির দিকে চেয়ে। আশ্বস্ত হয় তারা। জমিতে কীভাবে সোনা ফলাতে হয় সেটা যেন ভালো করেই জানে আজিত আর তার সহযোগীরা।

আজিতের চাষা বাহিনীর মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ নিখিলের কিন্তু আজিতের চেয়ে ওসমানের দিকে আগ্রহটা বেশি। ছোট বলে নিখিলের চাষাবাদে কোনো ভূমিকা নেই। তার সোনাদা ওসমান আর আজিতের সঙ্গে মাঠে কাজ করে, আর দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে সে চেয়ে দেখে ওদের কাজকর্ম। অবশ্য শুধু কাজ দেখেই তার তৃপ্তি নয়, অন্য আকর্ষণও আছে। জমির আলে দাঁড়িয়ে বেশ কদিন ধরে ওসমানের কাছে একটা বাঁশির বায়না করে আসছিল সে। কিন্তু কাজের চাপে এ কথা সে কথা বলে সে তাকে এতদিন ঠেকিয়ে রেখেছে। রঙ্গ করতে ওসমানের জুড়ি নেই, নিজের কাজের চাপ সে কোনোভাবেই বুঝতে দেয় না, কেবল কথা দিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে রাখে। সেই চাষের শুরুতে সে বায়না ধরেছিল এখন ধান পাকবার মুখে, তবু বাঁশি পাওয়া হয়নি তার। ওসমানও ভুলিয়ে রাখতে চায় ওদিকে সেও নাছোড়বান্দা, সহজে ভোলবার পাত্র নয়। অগত্যা ওসমান নিখিলের কাছে প্রতিশ্রুত হয় দু-একদিনের মধ্যে তাকে একটা বাঁশি বানিয়ে দেবে।

সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। সারা রাতে ঝরা শিশিরের মুক্তদানা সকালের ধানখেতে অপরূপ শোভা নিয়ে অপেক্ষা করে। সবুজে ঢাকা গ্রামটায় শরতের উৎসব এবার হয়নি, হেমন্তের শুরুতেও যেন অব্যক্ত নিঃসঙ্গতার পদধ্বনি। রাতে এখন হিম পড়া শুরু হয়েছে। সন্ধ্যার পর বই নিয়ে বারান্দায় বসে নিখিল স্যান্ডো গেঞ্জিটার ওপর কখনো গামছা চাপিয়ে নেয়। পড়তে বসেও মনে তার মাঝে মাঝে উঁকি দেয়—বাঁশি এখনও তাকে দেয়নি ওসমান, জানি না কবে ওসমানের মন গলবে।

এদিকে ইরিধানে পাক ধরেছে, দু-একদিনের মধ্যে কাটার মতো হয়ে যাবে। একদিন সুধীরমাস্টার আজিতকে ডেকে বলেন, 'ধান পেকে উঠেছে পাহারা দেয়া লাগবে আজিত। ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার সংবাদ আসছে। পাহারা না দিলে আমাদের ধানও থাকবে কি না কে জানে।' আজিত বৈষয়িক ব্যাপার বেশ ভালোই বোঝে। কথাটা তারও যে মনে হয়নি তা নয়। মাত্র দু-একদিনের অসচেতনতায় এতদিনের পরিশ্রম নষ্ট করতে সে রাজি নয়, তাই যে চিন্তা সেই কাজ। সুধীরমাস্টার নিজে, ন ছেলে মৃণাল (সোনা) আর আজিত—তিনজন মিলে পেকে ওঠা সেই ধান পাহারা দেয়ার মনস্থির করল। মাঠের পাশে যে বাঁশঝাড়ের জঙ্গল তার মধ্যে জায়গা বানিয়ে খড় আর বাঁশের চটা দিয়ে খুপরি বাঁধা হলো। আজিত ভাবে, বেশ হবে, বাঁশবনের মধ্যে হওয়ায় খুপরিটাতে রাতের বেলার হিম লাগবে না, আরামই হবে বটে।

সে রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়িষ্ণু চাঁদের মুখে কুয়াশা পড়ে রাতটাকে ভূতুড়ে মনে হচ্ছে। বাঁশঝাড়ের ওপাশটায় গাছপালার জঙ্গলে কী একটা পাখি বসে মাঝেমাঝে কুপ্ কুপ্ শব্দে ডাকছে। রাতজাগা এই পাখিটার মৃদু ডাক ছাড়া চারদিক ভীষণ নিস্তব্ধ। খড়ের খুপরিতে শুয়ে আজিত আর সোনা ঘুমিয়ে গেছে অনেক আগেই। সুধীরমাস্টারেরও চোখে ঘুম ঘুম, অনেকক্ষণ ধরে তিনি ঐ পাখিটার ডাক আনমনা হয়ে শুনছিলেন আর বর্তমানে দেশের পরিস্থিতির কথা

ভাবছিলেন। একসময় চোখ জড়িয়ে আসে তারও। মাঝরাত্রির এই অপার্থিব নৈঃশব্দ্যে একটা মৃদু আওয়াজে হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠেন তিনি। কীসের শব্দ ওটা? ধানকাটার শব্দই তো! ধড়মড়িয়ে উঠে ধীর পায়ে এগিয়ে, আলের পাশে দাঁড়িয়ে সুধীরমাস্টার দেখলেন অন্ধকারে যেন তিনটে মূর্তির মতো! যা ভেবেছিলেন তাই, কারা এসে ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে এই গভীর রাতে! দ্রুত ফিরে এসে আজিত আর সোনাকে ঠ্যালা দিয়ে জাগালেন তিনি। আচমকা জেগে উঠে ব্যাপার বুঝেই তারা হতবাক। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের লাঠি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তারা। চুপি চুপি পা টিপে টিপে হেঁটে দুজনে পৌঁছে গেল লোকগুলোর কাছে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আজিত আর সোনা ঐ অন্ধকারে ঠাহর করে দুজনের ওপর দিল লাঠির বাড়ি। আচমকা পিটুনি খেয়ে তারা চেঁচিয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে। সচকিত হয়ে অন্যজন অন্ধকারে কোথায় দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকে। বাড়ি খাওয়া লোকদুটিও পালানোর জন্য ছুট দেয়, কিন্তু খেতের আল থেকে নিচুতে পা পড়ায় একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় ধানখেতে। আজিত লাঠি হাতে তার দিকে এগিয়ে যেতেই লোকটি বিকট স্বরে চিৎকার করতে থাকে, 'ওরে মিঞাভাই বাঁচা রে, আমারে মাইরে ফেলালো রে।' এই চিৎকার শুনেই অন্ধকারে ধুপধাপ শব্দে কোথা থেকে ঘাপটি মেরে থাকা লোকটি বেরিয়ে আসে মুহূর্তেই। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সোনার মাথায় এসে পড়ে আচমকা এক লাঠির বাড়ি। কিন্তু সেদিকে যেন খেয়াল নেই তার। অন্ধকারে চিৎকার চেঁচামেচি আর লড়াই চলছে সমানে।

শোরগোল শুনে লোকালয় থেকে অন্য লোকজন এসে জুটে গেছে। বাড়ি থেকে ছুটে নিখিলও এসে দাঁড়িয়েছে খেতের পাশে। ততক্ষণে সে লোকগুলো গেছে পালিয়ে। বাড়ি থেকে আনা সেই আলোতে নিখিল দেখল তার সোনাদার মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে পা পর্যন্ত ভিজে যাচ্ছে। সম্বিৎ ফিরে পায় যেন সবাই। রাতও আর বেশি বাকি নেই, ধরাধরি করে সবাই মৃণালকে নিয়ে বাড়িতে এনে শুইয়ে দেয়। মাথায় কাপড় জড়িয়ে রক্ত বন্ধ করা হয় তখনকার মতো। এই রাতে ডাক্তার আসবে না তাই বাকি রাতটুকু মৃণালের সঙ্গে সবাই জেগে প্রতীক্ষা করে থাকে এই ভীষণ রাত্রিটা পোহাবার।

ভোরের আলো ফুটতেই একছুটে বেরিয়ে পড়ে নিখিল। এ পাড়া সে পাড়া ঘুরে ডাক্তারের দেখা পেলেও দেশের ভীষণ গণ্ডগোলের সময় ডাক্তার বাড়ি থেকে বেরুতে নারাজ। অনেক অনুনয় বিনয় করেও ব্যর্থ হয়ে একসময় সে ভগ্ন মনে সোনাদার দুর্দশার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। ফেরার পথে ঠাকুরবাড়ির কাছে একদল মানুষ দেখে থমকে দাঁড়ায় সে। তাদের পরনে সবার কালো কাপড়, হাতে অস্ত্র। কিছুদূর এগিয়ে দেখে কালো কাপড় পরা আরও একদল লোক তাদের বাড়ির উলটো দিকে যত বাড়ি আছে, সব বাড়ি ঘিরে সশস্ত্র অবস্থান নিয়ে যেন